শিকার

সৌম্যেন্দ্র গোস্বামী

যথা নিয়মে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। পাহাড়ের ছায়াগুলো দীর্ঘতর হতে হতে একসময় সূর্যটাই বাঁদিকের পাহাড়ের পিছনে অস্ত গেল। এখন সারা পাহাড় - জুড়ে শান্ত, গম্ভীর সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে। সুন্দর বটে তবে তারমধ্যেও গা ছমছমানি ভাব আছে। একেই শিশিরের শব্দের মতো সন্ধ্যা নামা বলে কিনা কে জানে? ডানদিকের নদীটা অজস্র ফেনার মুকুট পরে বর্ষায় স্ফীত জলধারা বয়ে নিয়ে চলেছে। ওর গন্তব্য সমতল পেরিয়ে সমুদ্রের দিকে। জলের রঙ মেটে মেটে লাল। রাস্তাটাও নদীটার সঙ্গে একসঙ্গে গেছে। কখনও অনেক নিচে নেমে গেছে আবার কখনও রাস্তার অনেক কাছে। এখন নদীটা অনেক নিচে। কৌশিক অবশ্য যাবে নদীর স্রোতের বিপরীতে। ওপারে নদীর পাড় দিয়ে খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল। সেখানে গাছে ঢাকা সবুজ পাহাড়ও থমথমে। দূরে, পাহাড়ের অনেক উপরে, একটা দুটো কাঁচাবাড়ি আছে। এইরকম বাড়ি সারা পাহাড় জুড়েই দেখা যায়। পড়ন্ত বিকেলের আবছা আলোয় কোনো কোনো বাড়িতে নড়াচড়ার আভাস পাওয়া যাচ্ছে, আলোও জ্বলছে। পাহাড়ের ওই দুর্গম জায়গায় বাড়িগুলো আছে। রাস্তাঘাট কিছুই নেই। ওখানে ওই বাড়িতে কারাই বা থাকে, করেই বা কি কে জানে। নদীর বাঁদিকেও খাড়া দেওয়াল রাস্তাটা তৈরি হয়েছে বাঁদিকের এই পাহাড়টা কেটেই। তাই প্রায় সারা রাস্তাতেই পাহাড়টা উঠেছে রাস্তা থেকে উল্লম্বভাবে। এবড়োখেবড়ো গা, মাঝে মাঝে রাস্তার উপর ভয়াবহ ভাবে ঝুঁকে পড়েছে।

জায়গাটা নির্জন। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত কৌশিক রাস্তায় মাঝে মধ্যে বাড়িফেরতা মানুষজনকে দেখেছে। তাদের মধ্যে কারুর পিঠে মালের বোঝা, কেউ দলবেঁধে, অনেকেই একা। একা যারা তারও কেমন আনমনা। গাড়ির আওয়াজে ক্লান্ত পাগুলো টেনে সরে দাঁড়িয়ে জায়গা করে দিয়েছে কৌশিককে। রাস্তার পাশে ঝর্ণারও অভাব নেই, বর্ষার সঞ্চয় নিয়ে তারা তাদের স্বাভাবিক ধারাপথ থেকে উপচে পড়ে রাস্তার উপর দিয়েই বইছে। তাতে রাস্তার মাটি ধুয়ে গিয়ে গোল গোল কাল পাথর বেরিয়ে পড়েছে। জায়গাগুলো পিছল হওয়াই স্বাভাবিক। নেমে দেখার সুযোগ হয়নি।

কৌশিক যেখানে যাবে রাস্তাটা ততখানিই গেছে। বহুক্ষণ ধরেই রাস্তাটা এসেছে কঠিন চড়াই পেরিয়ে তার উপর আছে অনবরত সুক্ষ্ম বাঁক। তবু এই রাস্তা দিয়ে যত জোরে গাড়ি চালান সম্ভব তত জোরে গাড়ি চালিয়ে প্রায় ছ'ঘন্টায় এ পর্যন্ত প্রায় একশ কিলোমিটার চলে এসেছে। একনাগাড়ে এতক্ষণ গাড়ি চালাবার জন্য সারা শরীরে কেমন যেন একটা ঝিমধরা ভাব মনে হচ্ছে। কাঁধ আর কোমরে যন্ত্রণা হচ্ছে। এরই মধ্যে আলো যেরকমভাবে কমে আসছে তাতে আর বেশিক্ষণ গাড়ি চালান যাবে না। তবে রাস্তাও আর বেশি নেই, মাঝে থামতে না হলে অল্পক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যাবে।

থামতেই হল। সামনেই রাস্তার ঠিক মাঝখানে একটা পাথর। প্রায় একটা ছোটখাট বাড়ির আকারের পাথরটা এইমাত্র পড়েছে। পাথরটা পড়ার বিকট শব্দও বাঁকের আড়াল থেকে কৌশিক শুনেছে। পাথরটা যদি আর কিছুক্ষণ পরে পড়ত তাহলে কি হত ভাবতেই শিউরে উঠল কৌশিক। পাথরটাকে পাশ কাটিয়ে এগনো যাবে কিনা দেখতেই গাড়ি থেকে নামা। যাওয়া যাবে, তবে ভীষণ বিপদজনক। যেতে গেলে ডানদিকের চাকাটা যেখান দিয়ে যাবে তার কয়েক ইঞ্চি পরই শুরু হয়েছে অতলস্পর্শী খাদ। বৃষ্টিতে ভিজে আলগা মাটি খাদের অত কাছে গেলে বসে যেতে পারে। সবে সন্ধে হচ্ছে এরই মধ্যে ঠান্ডায় হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে, এখনও সারারাত পড়ে আছে। আশপাশে জনমানুষের চিহ্ন নেই। শেষ জনপদটা অনেকক্ষণ আগে ছড়িয়ে চলে এসেছে। রাস্তা এখানে এত সরু যে গাড়ি ঘোরাবার জায়গা হবে না। তারপর এতক্ষণ যে চড়াই ভেঙে উঠেছে ফিরতে গেলে তা ভয়ঙ্কর উৎরাই। অন্ধকার নামছে, এখন এই পিছল রাস্তায় ব্যাকগীয়ারে যাবার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। একটু এদিক ওদিক হলেই কয়েক হাজার ফুট তলায় বর্ষায় ফুলে ওঠা নদীর তীব্র স্রোতের মধ্যে পড়তে হবে। বৃষ্টি পড়ছে গুঁড়ি গুঁড়ি। একটা কিছু করতেই হবে, সারারাত এই রকম ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

—'এ বাবু আগে ধস হ্যায়, গাড়ি নেহি যায়েগী।'

একটা লোক সামনের উৎরাই দিয়ে নামতে কথাগুলো বলল। লোকটি দাঁড়ায়নি হাঁটতে হাঁটতে কথাগুলো বলে আরো নেমে গেল। কৌশিক বেশ আনমনা হয়ে পড়েছিল। নিজের কাজ গোঁয়ার্তুমি হয়েছে একথা ভাববার ক্ষমতা নেই কৌশিক গুপ্তর। তবে সব দিক বিচার করে বলতেই হচ্ছে অবস্থাটা সুবিধাজনক নয়।

স্লেটের মতো পাতলা ছোট ছোট পাথর গড়িয়ে পড়বার খটখট শব্দে সম্বিত ফিরে এল কৌশিকের। পাথরটা কৌশিকের পায়ের উপর দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে থামল। পায়ে চামড়ার শক্তপোক্ত জুতোটা না থাকলে আঘাত লাগত। লোকটা তখন অনেকটাই এগিয়ে গেছে। আর কয়েক পা গেলেই পাহাড়ের বাঁকের আড়ালে চলে যাবে। কৌশিক ডাকল লোকটাকে।

—'এই শুন, আগে ধস কিতনা দূর?'

সামনের পাথরটাও একটা ধস, লোকটি এর কথা বলে নি। সে জানাল এখান থেকে দু কিলোমিটারের মতো দূরে আর একটা বড় ধস আছে। সবথেকে কাছের গ্রাম চার কিলোমিটার, সেটাই কৌশিকের গন্তব্য। তার আগে রাত কাটাবার মতো অন্য কোনো জায়গা নেই। তবে পরবর্তী গ্রামটাতো 'নজদিকমেই হ্যায়', হেঁটে যেতে মাত্র ঘন্টাখানে সময় লাগবে।

এই পাহাড়িদের বেশিদূর নয় কথাটার মানে মারাত্মক হতে পারে। ঘন্টাখানেক মানেও বহুক্ষণ হতে পারে, তবু উপায় নেই, যেতেই হবে, হেঁটেই যেতে হবে। চোর - ডাকাতের ভয় নেই, গাড়িটা এখানেই রেখে গেলে চিন্তার কিছু নেই।

—'ফরেস্ট বাঙলো তক যানা হ্যায়। চলোগে মেরে সাথ?'

—'ন্যাহি বাবু মেরেকো নিচামে কাম হ্যায়। আভি হ্যাম উধার যা ন্যাহি সাকেগা।'

—'আরে চলো ইয়ার, রুপেয়া পায়সা কুছ মিল যায়েগা'

—'ন্যাহি বাবু হমা ন্যাহি যায়েগা।'

—'অন্ধেরা হে রাহা হ্যায়। হাম ইধার কা রহেনাবালা নেহি হ্যায়। মেরে লিয়ে আকেলা যানেসে কুছ মুসিবৎ হোগা। চলো ইয়ার।'

—'আরে ডরনেকা ক্যায়া হ্যায়। নজদিকমেই তো হ্যায়। যাইয়ে না।'

বহু নিচে দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। দ্রুত আলো কমছে। একলাই যেতে হবে কৌশিককে। কৌশিক চিরকালই বড়লোকের ছেলে। বুদ্ধিমান, স্বাস্থ্যবান, লেখাপড়ায় ভালো। বয়স তিরিশের একটু উপরে। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে আধাসরকারি ইঞ্জিনিযারিং কোম্পানিতে এই বয়সেই এতবড় প্রোজেক্টের এত দায়িত্বপূর্ণ পদে উঠেছে। ঈর্ষাদায়ক কেরিয়ার। সবকিছুর পেছনে

কৌশিকের মামা আর তারা থেকেও বেশি ওর বাবী শ্বশুরের সরকারি হাত থাকতে পারে, কিন্তু কৌশিক যে একদমই অযোগ্য একথাও ঠিক নয়। এ অঞ্চলে কৌশিক এসেছে পদোন্নীত হয়ে। তাও বেশ কয়েক মাস হয়ে গেল।

কৌশিক নিজেকে মনে করে সে পাঁচজনের যে কোনো একজন নয় একদম পঞ্চমজন। কারণে অকারণে প্রকাশও করে সেকথা। কৌশিকের মুখের উপর সে কথার প্রতিবাদ করবে এমন সাহসী লোক আজ পর্যন্ত কৌশিক বেশি দেখেনি। অতি নিরাপদ দূরত্বে অবশ্য এসব কথার ব্যঙ্গ বিদ্রুপ হয়। সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কিন্তু কৌশিক বুদ্ধিমান। সে জানে শুধুমাত্র কথায় কাজ হয় না। মাঝে মধ্যে কিছু করতে দেখাতে হয়, ইচ্ছা না থাকলেও সেদিকেই যাচ্ছিল। গুরুদাল সিং-এর ম্যারেজ অ্যানিভার্সারির পার্টিতে কৌশিক যখন হিমাচল প্রদেশে একদিনে বাহান্ন কিলোমিটার ট্রেকিং করে বিকেলে হোয়াইট আউটে হারিয়ে যাবার গল্প শোনাচ্ছিল তখন হঠাৎ অরোরা বলে বসল 'বাই দ্য ওয়ে! মিঃ গুপ্ত শুনছিলাম সেদিন নাকি আপনি সন্ধ্যেবেলা ডিহিরি থেকে ফিরতে পারছিলেন না। ডিহিরি অবশ্য এখান থেকে আট কিলোমিটারের মতো হবে।' দেখা গেল ব্যাপারটা সবাই জানে। সেদিন সাইট ইনস্পেকশন করে ফিরছিল, তখন সবে বিকেল নামছে, রাস্তাও তখন প্রায় ছয় কিলোমিটার বাকি, এমন সময় গাড়িটা গেল খারাপ হয়ে। সামনের রাস্তাটা গেছে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তার উপর কঠিন চড়াই। ড্রাইভার বনেট খুলে খোঁচাখুঁচি করতে করতেই সন্ধ্যে নামল। নিজেকে ভাবে না। কিন্তু সামনে কঠিন চড়াই ভেঙে বনের ভেতর দিয়ে অন্ধকারে না যাবার নানারকম যুক্তি আর কারণ ছিল আর ড্রাইভার যখন বলল আপনি তাহলে এখানে দাঁড়ান আমি নিচে থেকে অন্য গাড়ি পাওয়া যায় কিনা দেখে আসছি, তখন তার বিরুদ্ধে কৌশিক অন্য নানারকম যুক্তি আর কারণ দেখাল। অগত্যা গাড়িটা সেখানেই রেখে ড্রাইভারকে কৌশিকের সঙ্গে ফিরতে হল।

কাজটা অত্যন্ত বেআইনি হয়েছে। গাড়ি ফেলে ড্রাইভার এইরকম ভাবে চলে আসতে পারে না। ড্রাইভারের চাকরি যেত। তাতে কৌশিকের কিছু যেত আসত না। কিন্তু এক্ষেত্রে যেহেতু কৌশিকের মান - ইজ্জতের ব্যাপারটা জড়িয়ে তাই কৌশিককে হস্তক্ষেপ করতে হল। ড্রাইভারের চাকরি বাঁচাল। অরোরাও এমন সুযোগ বহুদিন ধরে খুঁজছিল, সেই বা এখন ছাড়বে কেন? সেও ড্রাইভারের কাছে সব শুনে কৌশিক সেদিন চড়াই ভাঙতে কিরকম নাস্তানাবুদ হয়েছিল— সমস্ত ব্যাপারটা প্রচার করে দিল। অবশ্য অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে। অরোরা এখানে সেই ইঙ্গিত দিয়েছে। অরোরা অস্ত্রটা ছোড়ে মোক্ষম সময়। এইরকম সুযোগ বহুদিন ধরেই খুঁজছিল আরোরা। কৌশিক নিজেকে পর্বতারোহী, অভিযানকারী, প্রকৃতিপ্রেমী হিসাবে প্রচার করে এরপর তা বজায় রাখা কঠিন।

কৌশিকের বেইজ্জতি যে সবাই উপভোগ করছে এমন নয়। ব্যাপারটা যদি এখানেই শেষ হত তাহলেও নাহয় হত। অরোরাকে ঠিক সময়ে দেখে নেওয়া যাবে। কিন্তু চ্যাটার্জীই, অবশ্য অনেক জুনিয়ার। যখন অরোরার কথায় সবাই থতমত খেয়ে গেছে তখন চাটার্জীর বাচ্ছামতো সুন্দরী বউ হাসি চাপতে গিয়ে বিষমটিষম খেয়ে এমন কান্ড করল যে তারপর একটা কিছু করতেই হয়। বউটার হাসি অন্য কেউ দেখেছে কিনা সন্দেহ কিন্তু কৌশিক ভোলে নি।

কোনো ঝুঁকিই নেয়নি কৌশিক। তাই এই সময়টাই বাছতে বাধ্য হয়েছে। গুরদয়ালের পার্টির পর মাস দুয়েক কেটেছে। গুরদয়ালের পার্টির পরই যদি কৌশিক এখানে আসত তাহলে ব্যাপারটা হাস্যকর হত আবার এর থেকে বেশি দেরি করলেও আজকের সঙ্গে সেদিনকার প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখনও এইদিকে বর্ষা, হিসাব অনুযায়ী এইসময়ে বর্ষা চলে যাবার কথা। তবে এবার বর্ষা এসেছে দেরি করে। এদিককার ডেপুটি ফরেস্ট অফিসার কৌশিকের ভাবী শ্বশুরের কৃপাপ্রার্থী। তাই তাকে বলে এখানে আসবার ব্যবস্থা করতে কোনো অসুবিধাই হয় নি। ডি. এফ.ও. স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

লোকটা চলে যাবার পর কৌশিক বেশ ভয়ই পেল। মালপত্র তেমন কিছু নেই। একটা ছোট রুকস্যাক আর সীটের তলায় রাইফেলটা— কিন্তু এ দুটো সামান্য মাল নিয়েও অন্ধকারে চড়াই ভাঙা কৌশিকের কাছে খুব সোজা হবে না। আসবার সময় কৌশিক যে ঝর্ণাগুলো দেখেছে সেরকম উপচে পড়া ঝর্ণা নিশ্চয়ই আরো আছে।

গাড়িটা যথাসম্ভব পাহাড়ের দেওয়ালের দিকে সরিয়ে রেখে রুকস্যাকটা পিঠে তুলতে গিয়ে কৌশিক বুঝতে পারল এই দুটো নিয়ে হাঁটা সত্যিই সম্ভব হবে না। এইরকম ভাবে একা না এসে বোধহয় কাউকে সঙ্গে আনা উচিত ছিল। কেউ মানে অবশ্য যে কোনো কেউ নয়। চ্যাটার্জীকে আনা যেত। সরাসরি বললে কি আর না বলতে পারত? সামনেই ওর প্রমোশন যেটা প্রায় পুরোটাই কৌশিকের উপর নির্ভর করে। চ্যাটার্জী সেটা জানে। তবে একথ্য ঠিক চ্যাটার্জীকে না নিয়ে আসা একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। আর কেউ না জানুক অন্তত কৌশিক জানে অথচ স্বীকার করে না অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে চ্যাটার্জী এমন কি ইঞ্জিনিয়ারিংটাও কৌশিকের থেকে অনেক বেশি জানে আর বোঝে। আর এই পাহাড়ে ওঠা ইত্যাদি ব্যাপারে চ্যাটার্জীতো একজন বিশেষজ। তাই চ্যাটার্জী এলে এখন খানিক সুবিধা হত ঠিকই কিন্তু কৃতিত্বটা চ্যাটার্জীর উপরও যেত। কৃতিত্বে কোনো ভাগ কাউকেই দিতে চায়নি কৌশিক। তবে চ্যাটার্জী মালটা পেয়েছে বটে! আজ পর্যন্ত কৌশিককে কোনো ইঙ্গিত দিল না। কি যেন নাম বেলা? না না বেলী! বেলী!

—'ক্যায়া বাবু গিয়া নেহি।'

গলা শুনে কৌশিক বুঝতে পারল সেই লোকটাই। কৌশিক বলল,

—'কি ব্যাপার তুমি ফিরে এলে যে?'

—'মেরেকো নিচামে যানাই যানা। মগর আপ আকেলা যানেসে ডর রহা থা, ইসি লিয়ে হাম্য আছে।'

—'ফরেস্ট বাঙলো পর্যন্ত যাব। কত লাগবে?' একথার উত্তর দিতে লোকটা একটু দেরি করল তারপর আস্তে আস্তে বলল— 'পয়সা কে লিয়ে নেহি, আপ আকেলা যানেসে ডর রাহা থা...। যো আপকা মর্জি।'

রুকস্যাকটা তুলে নিলে লোকটা। কৌশিক সীটের তলা থেকে রাইফেলটা বার করল। অন্ধকার, নির্জন রাস্তায় রাইফেল দেখে লোকটা চমকে উঠল বলল 'বন্দুক? বন্দুক কিস লিয়ে?'

—'কুছ নেহি । চল'

রাইফেলটা দেখে নড়ে না লোকটা। একবার রাইফেলটার দিকে একবার কৌশিকের দিকে তাকাতে থাকে। কৌশিক আর একবার যেতে বললেও লোকটি দাঁড়িয়েই রইল। অগত্যা রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে কয়েক পা এগিয়ে তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে রাইফেলটি নামায়। লোকটা তখনও দাঁড়িয়েছিল। কৌশিক বলে 'ক্যা হুয়া' লোকটি কোনো উত্তর দেয় না। কৌশিক রুকস্যাক থেকে টর্চ বার করে জ্বালে। টর্চ হাতে এগিয়ে যেতে জিজ্ঞেস করে 'আগে জাদা চড়াই হ্যায় ক্যায়া?'

এতক্ষণে লোকটির আতঙ্ক একটু কমেছে। লোকটা উত্তরে বলে— 'জাদা নেহি। হ্যায়, থোরা বহুত।'

জায়গাটা সমুদ্রতল থেকে অনেক উঁচুতে। এত উঁচুতে রাইফেলটাও বয়ে নিয়ে যেতে হলে ভারী লাগে। আপাততঃ ওটাতে গুলি ভরা নেই। চলতে চলতে কৌশিক একটু ভাবে তারপর লোকটিকে বলে 'এ রাইফেল তুম লে সাকোগে?'

—'লেকিন এ বন্দুক কিস লিয়ে?'

সে কথার উত্তর না দিয়ে রাইফেলটা লোকটির দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বল,

—'নাম ক্যা হ্যায় তেরা?'

—'জী রামশরণ।'

—'রামশরণ?'

—'জী।'

রাইফেলটা ডি.এফ.ও.-ই কৌশিককে দিয়েছে। সম্ভবত লাইসেন্সবিহীন চোরাই রাইফেল। কৌশিক কিছু জিজ্ঞেস করে নি। ডি. এফ. ও.-ও কিছু বলেনি। শুধু বলেছিল 'ভয়ের কিছু নেই তবে আপনিও এটা সাবধানে ব্যবহার করবেন। ওদিকের ফরেস্ট গার্ডকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। সবরকম সাহায্যই পাবেন। কি যেন নাম লোকটার! দাঁড়ান এই যে লেখা আছে। হ্যাঁ মহাবীর সিং। এখনও ওদিকটায় ভালো বৃষ্টি হচ্ছে, সঙ্গে এক্সট্রা জুতো নেবেন একটা। আর বলুন! আপনার জন্য আর কি করতে পারি? আমার ব্যাপারটাতো এখনও কিছুই হল না।'

—'দেখছি সামনের কুড়ি তারিখে দিল্লি যাব। উঠি তাহলে। ফিরে এসে দেখা হবে।'

—'হ্যাঁ, ফিরে এসেই কথা হবে।'

টর্চের আলো যেটুকু জায়গায় পড়েছে সেটুকু জায়গা আলোকিত করেছে বটে কিন্তু তার বাইরে অন্ধকারকে আরো ঘন করেছে। নিজের হাত - পাগুলো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। রামশরণ কৌশিকের আগেই চলেছে। বৃষ্টির তেজ বেড়েছে। রামশরণ গায়ে একটা প্ল্যাস্টিকের প্যাকেটের মতো ছেঁড়া রেনকোর্ট, কৌশিকের গায়ে অবশ্য দামি রেনকোর্ট। তবু শরীরের যেটুকু অংশ ঢাকা নেই বিশেষত মুখমন্ডলে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো যেন বিঁধছে। জোরে হাঁটলে শীত করে না। জোরে হাঁটবার ক্ষমতা কৌশিকের নেই, ক্রমশই হাঁটা শ্লথ হয়ে যাচ্ছে।

রাস্তাটা কৌশিক যেমন আশঙ্কা করেছিল তার থেকে অনেক বেশি কষ্টদায়ক। প্রায় সারা রাস্তায় এক ইঞ্চি থেকে চার ইঞ্চি গভীরতায় কনকনে ঠান্ডা জল গড়াচ্ছে, স্রোতও প্রচন্ড। দামি ট্রেকিং শ্যুয়ের মধ্যে ঠান্ডা জল ঢুকে গিয়ে মোজা ভিজে গেছে। ঠান্ডায় পায়ে জ্বালা করছে। এক জায়গায় তো গোড়ালির উপর জলই কৌশিককে টলিয়ে দিয়েছিল। রামশরণ ধরে না থাকলে একটা বিপদ ঘটত। ক্লান্তিতে শরীর আর বইছে না। রুকস্যাকের মধ্যে হুইস্কির বোতলটা আছে। সেটা থেকে একটু খেলে হত। তারও কোনো উৎসাহ নেই।

—'আর কিতনা দূর?'

—'আ গিয়ো বাবু। দশ মিনিট।'

এই কথাটা রামশরণ অন্তত চল্লিশ মিনিট ধরে বলছে। ক্লান্তিতে কৌশিকের মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে আর বোধহয় পারবে না। এমনকি এই অভিযানের কথা চ্যাটার্জী বউটাকে শোনাবার কথা কল্পনা করেও উৎসাহ পাচ্ছে না। ওফ্ চ্যাটার্জী মালটা পেয়েছে ভালো। প্রজেক্টের আর সবাই যখন কৌশিকের নজরে পড়বার জন্য লালায়িত তখন সে কৌশিককে পাত্তাই দেয় না। যদিও ভদ্র - সৌজন্যমূলক ব্যবহারের কোনো ঘাটতি নেই। আর সেটাই কৌশিকের কাছে অসহ্য। কৌশিক সুবক্তা। আজকের অভিযানের কথা শুনিয়ে কৌশিক নিশ্চয়ই কাজ গুছিয়ে নিতে পারবে। চ্যাটার্জীর বউ ছাড়াও আরো অনেকে শোনবার মতো আছে, তবে চ্যাটার্জীর বউ -এর কাছে তারা কিছুই নয়।

কৌশিকের অবস্থা যখন আর কিছুতেই কিছু এসে যায় না গোছের, ফরেস্ট রেস্ট হাউস আর কত দূর তাতেও কোনো উৎসাহ নেই, তখন রামশরণের কথায় চমক ভাঙল 'ও দেখ বাবু আ গিয়া।' সত্যিই একটা আলো দেখা যাচ্ছে। এতক্ষণ কৌশিক বুঝতে পেরেছে রামশরণ ছাড়া আজ আসতে পারত না। জ্যাক লন্ডনের একটা গল্প মনে আছে। একটা লোক কোথায় যাবার সময় রাস্তাতেই ঠান্ডায় জমে মারা গেল। আজ মনে হয়েছে কৌশিকেরও তেমন হতে পারত। তবে হ্যাঁ, সুবক্তা কৌশিক গুপ্ত আজকের অভিযানকে জ্যাক লন্ডনের ঢঙে বর্ণনা করলে তার একটা আলাদা মাত্রা পাবে। আর কৌশিক গুপ্ত তা করবেও। আজই সব নয়। আগামী কালের ব্যাপারটাও আছে। সেটার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। পার্টিটা ঠিক করে অ্যারেঞ্জ করতে হবে। চ্যাটার্জীর বউটা আসবে তো?

—'মহাবীর! এ মহাবীর।'

ফরেস্ট বাঙলো এখনও অসম্পূর্ণ। মাত্র দুটি ঘর বাসযোগ্য করে রেখে দেওয়া হয়েছে। বাথরুম পায়খানা এখনও হয় নি। সেইজন্যই বোধহয় বাঙলোটার উপর কারুর নজর পড়ে না। মহাবীরের জন্য আলাদা চালাঘর রয়েছে। মহাবীর তার ভেতর থেকেই সাড়া দিয়ে একটা হ্যারিকেন নিয়ে বেরিয়ে এল।

এখানে ফরেস্ট বাঙলোর আলাদা কেয়ার টেকার নেই। মহাবীর ফরেস্ট গার্ড, ও-ই কেয়ার টেকার। হ্যারিকেনের আলো রামশরণের গায়ে পড়েছে। রামশরণের বয়স কত আন্দাজ করা কঠিন তবে পঞ্চাশের উপরই হবে। সারা শরীরের দারিদ্রের উৎকট চিহ্ন। ছেড়া রেনকোটের ভিতর বহু পুরনো প্যান্ট আর সোয়েটার, বহুদিন কাচা হয়নি। মুখে বলিরেখা তার উপর আঁচিল অথবা বসন্তের দাগ হ্যারিকেনের অল্প আলোয় বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু কদাকার লাগছে। মহাবীর পোশাক আশাকের দিক থেকে একটু ভদ্রস্থ, বয়স রামশরণের থেকে কিছু কম কিন্তু সেও মাঝবয়সী।

মহাবীর এগিয়ে এসে কৌশিককে নিয়ে বাঙলোর বারান্দায় উঠল 'অপকা বুকিং?'

—'ডি. এফ. ও. সাহেব কোই খবর ভেজা নেহী? মেরা নাম কৌশিক গুপ্ত।'

মহাবীর একটু ইতস্ততঃ করছিল তবে কাগজপত্রের আর প্রয়োজন হল না। ডি. এফ. ও. আর কৌশিক গুপ্তর নামেই কাজ হল। শীতে, ক্লান্তিতে অথবা দুটোর সম্মিলিত কারণে কৌশিক তখন ঠকঠক করে কাঁপছিল। অন্যসময় হলে একটা সামান্য ফরেস্ট গার্ডের কাছে নিজের পরিচয় দিতে ঘৃণা বোধ করত কৌশিক, এখন ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি মেটাবার জন্য তাই করতে হল।

রাইফেল নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেনি মহাবীর। বলল— 'চায়ে পিজিয়েগা?'

—'মিলেগা?'

ডি. এফ. ও. মহাবীরকে ঠিকঠাক খবরই পাঠিয়েছিল। মহাবীর এই অঞ্চলে বেশিদিন নেই। এই ফরেস্ট বাঙলোটা হবার পরই এখানে এসেছে। এর আগে অন্য ফরেস্ট বাঙলোয় ছিল। সেখানেও কৌশিকের মতো অনেক সাহেব 'রিল্যাক্স' করতে যায়। সেই জায়গাটার যোগাযোগ ব্যবস্থা এখানকার তুলনায় ভালো বলে সাহেবরা বেশি যায়। তাই মহাবীর সাহেবদের নির্দেশের ঠিক ঠিক মানেই বোঝে। এবারও ডি. এফ. ও. সাহেবের নির্দেশের প্রকৃত মানে বুঝতে ভুল হয়নি। সে আট বছর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করছে এখনও টেম্পোরারি। সামনে দু-এক বছরের পার্মানেন্ট হবে একটা আশা আছে, তার জন্য বিশেষত ডি. এফ. ও. সাহেবের দাক্ষিণ্য প্রয়োজন। ডি. এফ. ও.-র খবর পাঠাবার ধরন দেখেই মহাবীর বুঝেছে সামনের মালটি নেহাত হেলাফেলার নয়। তাই মালটি যতবড় শুয়ারকা

বাচ্চাই হোক না কেন, মহাবীরের ত্রাতা হতেই পারে। ডি. এফ. ও. সাহেব যা বলেছে ততটা বটেই বরং তার থেকে বেশি কিছু করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে ঠিক করল মহাবীর।

রুকস্যাকটা দামি তাই ব্যাগের ভিতরে জিনিসপত্রগুলো তেমন ভেজে নি। জামাকাপড়গুলো প্রায় শুকনোই আছে। জামাকাপড় বদলে কম্বলের ভেতর ঢুকতে না ঢুকতেই মহাবীর চা নিয়ে এল। টেবিলের উপর হুইস্কির বোতলটা আগেই দেখেছে মহাবীর।

—'রাতকো খানা চাহিয়ে?'

—'মিলেগা?'

—'জি মিলেগা। মগর হাম খুদ আজ খানা নেহি পাকা সকতা। রামশরণকা ঘরসে মাঙ্গা দুঙ্গা।'

কৌশিক বুঝেছে কাল একা কিছু করা যাবে না। রামশরণের মতো কাউকে চাই। মহাবীর বলল রামশরণ আজ আসতে পারবে না। ওর তবিয়ৎ ঠিক নেহি, বুখার আ গিয়া। খবরটা দিয়ে চলে যেতে পারত মহাবীর, কৌশিকও তাই চেয়েছিল কিন্তু তা না করে নানা খেজুরে আলাপ শুরু করল। কৌশিকের অবশ্য মহাবীরকে দিয়েই কাজ চলত না এমন নয়। কিন্তু যখন মহাবীর তার চাকরির সমস্যাটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে ডি. এফ. ও. -কে সুপারিশ করার কথাটা বলল তখন কৌশিক সিদ্ধান্ত নিল রামশরণ ভাল।

সেরাতে একদম ঘুম হয়নি কৌশিকের। প্রচন্ড ঠান্ডায় পাশ ফিরতে গেলেই ঘুম ভেঙে যায়। তার ওপর একটু তন্দ্রা আসলেই সন্ধ্যেবেলা হেঁটে আসা রাস্তাটায় ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথাগুলো মনে পড়ে প্রচন্ড চমকে তন্দ্রাটুকুও ভেঙে গেছে। তাছাড়াও আর একটা কারণ ছিল। কাল রাতে সত্যিই রামশরণ আসেনি। তার বদলে খাবার নিয়ে এসেছিল একটা মেয়ে—রামশরণের ভাইঝি। কৌশিকের তখন একটু আচ্ছন্ন ভাব এসেছিল। মেয়েটির ঘরে ঢোকার সামান্য শব্দেই সেই আচ্ছন্নভাবটুকু কেটে যায়। চোখ খুলেই হঠাৎ ঘরের মধ্যে মেয়েটিকে দেখে চমকে উঠে। একে এখানে এইরকম পরিস্থিতিতে আসা করেনি কৌশিক। বয়স কুড়ির নিচেই হহবে। এক হাতে কৌশিকের খাবার অন্য হাতে একটা মোমবাতি। ঠকঠক করে কাঁপছিল মেয়েটি। পরণে অত্যন্ত মলিন পুরনো পোশাক। কৌশিকের মনে হচ্ছিল ওর দুরন্ত যৌবনকে ঢেকে রাখবার জন্য পোশাকগুলো যথেষ্ট নয়। তারপর যখন কৌশিকের দিকে তাকিয়ে ঝকঝকে দাঁতগুলো অল্প একটুখানি বার করে একটু হাসল তখন একটা শিহরণ খেলে গেল কৌশিকের শরীরে। ব্যাপারটা এই পর্যন্তই। তারপর খাবারটা টেবিলের উপর রেখে চলে যায় মেয়েটি। মহাবীর খাবার পরিবেশন করে। তারপর থেকে সারারাতই কৌশিকের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে মেয়েটি। কেবলই মনে হয়েছে মেয়েটির হাসি এক নিশ্চিন্ত প্ররোচনা। নারীমাংস দুর্বল নয় কৌশিকের কাছে, নারীমাংসকে কোনোদিন অনাদরও করেনি। কিন্তু আজ কৌশিক যে মাংস দেখেছে তা আসল জংলী, অনাস্বাদিত। কশাই-এর দোকান থেকে পয়সা দিয়ে কেনা নয়। একে শিকার করে নিতে হবে। তারপর বাকিটা রাত খুব অস্বস্তিতে কেটেছে কৌশিকের। যতবারই তন্দ্রা ভেঙেছে ছটফট করেছে কৌশিক। হয় মেয়েটার তা না হলে বেলী চ্যাটার্জীর চামড়ার স্পর্শের আকাঙ্ক্ষায় আঁকড়ে আঁকড়ে ধরেছে বালিসটাকে । ভোরের দিকে অবশ্য একটু ঘুম এসেছিল কিন্তু যখন মহাবীরের ডাকে ঘুম ভাঙল তখনও কৌশিক বুঝতে পারল ঘুমের মধ্যেও তার মাথায় মেয়েটার কথা ঘুরছিল।

সে রাতে চরম ছটফটানির মধ্যে কৌশিক প্রথম উপলব্ধি করল সেদিন গুরদয়ালের পার্টিতে চ্যাটার্জী বউ-এর হাসির মধ্যে একটা তীব্র বিষ ছিল। সে বিষ ঘৃণার অরোরাকে কৌশিক দেখে নেবে সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই, খালি সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু ওই মাগীকে? চ্যাটার্জী নিজেও সেইরকম। প্রজেক্টের অন্য অফিসারদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কোনোদিন বুঝতেই পারল না চ্যাটার্জীকে। চ্যাটার্জী জানে তার প্রমোশন কৌশিকেরই হাতে তবু কোনোদনি চেষ্টাই করল না। কৌশিক কাল রাতে নিজের কাছেই অস্বীকার করতে পারেনি যে মাগীটার জন্য চ্যাটার্জী কৌশিকের থেকে অনেক বেশি যোগ্য। বেলী চ্যাটার্জীর চোখের নিঃশব্দ হাসি রাতে ছিন্নভিন্ন করেছে কৌশিকের চেতনাকে। কৌশিক বুঝেছে বেলা চ্যাটার্জীর হাসির মধ্যে ঘৃণার সঙ্গে আরোও একটা অনুভূতি ছিল সেটা একটা ভয়ঙ্কর উদাসীনতা। কৌশিক গুপ্ত অর্থবান, ক্ষমতাবান। আজন্ম লালিত শিক্ষায় সে জেনে এসেছে যারা অর্থবান আর ক্ষমতাবান তাদের পায়ের ওপর যারা অর্থবান আর ক্ষমতাবান নয় তারা হুমড়ি খেয়ে পড়বে। তাদের অবশ্য মাঝে মধ্যে দয়া করা যেতে পারে, কিন্তু বিনামূল্যে নয়। সেই মূল্য যা কৌশিক নিজেই দিয়ে য়াকে। সেই মূল্য দিতে গিয়ে আজ কৌশিক এক অত্যন্ত প্রভাবশালী সরকারি আমলা কন্যার প্রাণিপ্রার্থী হয়েছে। সেই প্রভাবশালী অফিসারের কন্যার প্রতি কোনো শারীরিক বা মানসিক আকর্ষণই বোধ করেনা কৌশিক, তবু তাকেই সে বিয়ে করবে। তাই সে মূল্যের ষোল আনা অপরের কাছ থেকে উশুল করে নিতে জানে কৌশিক, নেয়ও। চ্যাটার্জীর ভবিষ্যৎ কৌশিকের হাতে। তাই তার নিরাপত্তার জন্য কৌশিক কিছু মূল্য দাবি করবেই। চ্যাটার্জীকেও সে মূল্য শোধ করতে হবে সম্মান দিয়ে, ইজ্জত দিয়ে। অন্তত সেইরকম চেয়েছিল কৌশিক। কিন্তু বারবারই তার প্রতিহিংসাপরায়ণ আক্রমণ দুর্ভেদ্য ভদ্র, সৌজন্যমূলক আচরণের বর্মে প্রতিহত হয়ে কৌশিকের নিজের কাছেই ফিরে এসেছে। তাই সেদিন রাতে আর নিজেকে সামলাতে পারেনি কৌশিক। বাইরে তখন তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রি সেন্ট্রিগ্রেডের নিচে। তবু একা নির্জন অন্ধকারে ঘরে বিছানায় উঠে বসেছে। অন্য কিছু করার ছিল না বলে টর্চ জ্বালিয়ে বোতল থেকেই গলায় ঢেলেছে হুইস্কি। নির্জলা হুইস্কি যখন বুক আর পাকস্থলীতে জ্বালা ধরিয়েছে তখনই খানিক শান্ত হয়েছে কৌশিক, সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝেছে যে বেলী চ্যাটার্জী তার ধরাছোঁয়ার বাইরে। আর তখনই ঠিক করেছে এবার দিল্লি গিয়ে প্রথমেই চ্যাটার্জীর প্রমোশনের ব্যবস্থা করবে। হয়েও যাবে। দরকার হলে তার ভাবী শ্বশুরকে নিয়ে ডি. এফ.-এর সাথে পর্যন্ত দেখা করবে। তাহলেই একটা শিক্ষা দেওয়া যাবে মাগীটাকে। এই সিদ্ধান্ত নেবার পরই ছটফটানি কমে একদম শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে কৌশিক। তখন অল্প অল্প করে বাইরে অন্ধকার হালকা হচ্ছে।

আজও রোদ ওঠে নি। বৃষ্টি একটু ধরেছে। অল্প কুয়াশা আছে। মেঘলা আকাশ। রোদহীন সকালের আলোয় জানলার বাইরে গাছে ঢাকা পাহাড়টা আরও বেশি থমথমে লাগছে। যথারীতি ক্রমান্বয়ে রামশরণ আর মহাবীর আসে। রামশরণ এসে নমস্কার করে সামনের ভাঙা চেয়ারটাতে বসে। কথাবার্তা হয়। কিন্তু রামশরণ কিছুতেই যেতে রাজি হয় না।

—'নেহি বাবু! হাম নেহি যায়েগা।'

—'কেন তুমি পারবে না?'

—'ও বাত নেহি। হাম নেহি যায়েগা। হিরণ মেরেকো ক্যা বিগাড়া। ওদের মারা কি ঠিক?'

—'আরে চলো ইয়ার! একটা মারলে কি হবে?'

—'না বাবু হাম নেহি যায়েগা।'

সকাল থেইে একটা অবসাদ পেয়ে বসেছে কৌশিককে। কাল রাতে হুইস্কির হ্যাঙ্গওভার আছে। তার ওপর বেলী চ্যাটার্জীর সম্বন্ধে কৌশিক সে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে তা পরাজয়ই। সেই পরাজয়েরও একটা তীব্র অবসাদ আছে। রামশরণ যেতে রাজি না হলেও মহাবীর আছে। মহাবীর মানেই সেই প্যানপ্যানানি। সেই একরকম, গুরদয়ালের মতো, শ্রীবাস্তবের মতো, সাকসেনার মতো

এমনকি অরোরার মতো, রামশরণকে এদের দলে ফেলা যায় না। রামশরণের সঙ্গে একমাত্র চ্যাটার্জীরই মিল আছে। কাল রাতে রামশরণ টাকা নিতে ও আসে নি, আজ রামশরণ টাকা নিয়েও এখানে আসতে রাজি হল না। অথচ মহাবীরের কাছ থেকে কৌশিক শুনেছে দুবেলা খেতে পর্যন্ত পায় না।

রেস্ট - হাউসে আর গাড়ির রাস্তা থেকে অনেকখানি উঠে আসতে হয়েছে। কাল রাতে বৃষ্টির সঙ্গে অল্প কিছু বরফ পড়েছে। রেসট - হাউসের আশেপাশে সেসব এতক্ষণে গেলেও এদিকটা এখনও কিছু রয়ে গেছে। পায়ে চলা রাস্তাটাও যেমন পেছল তেমন খাড়াই। শেষের দিকে যে জায়গা দিয়ে হাঁটতে হয়েছে। এই অংশটুকু উঠতে প্রচন্ড কষ্ট হয়েছে কৌশিকের। নিশ্বাসের কষ্টটা এমন জায়গায় চলে যাচ্ছিল যে মাথা ঘুরতে আরম্ভ করছিল, চোখের দৃষ্টি আবছা হয়ে আসছিল। তবু কৌশিক এমন জায়গায়ই চেয়েছিল। খাড়া কয়েক'শ ফুট দেওয়ালের নিচেই চারদিকই পাইন গাছ দিয়ে ঘেরা একটা বড় ঢালু ঘাস জমি। পাহাড়ের গা ঘেঁষে একটা পাথরের উপর বসেছে ওরা। এখানে এসে বসবার খানিক পরে ক্লান্তিজনিত অসুবিধাগুলোও কমেছে। রাইফেলটা এখন কৌশিকের কোলের উপর। এখন ওটাতে গুলি ভরা।

কিন্তু সঙ্গে একটা রাইফেল থাকলেই শিকার হয় না। আরও কায়দা - কানুন আছে। এলেম লাগে। এদিকে হরিণ ঘোরাফেরা করে বড় দলে। কৌশিক কল্পনা করে রেখেছিল একটা বড় হরিনের দলের সঙ্গে নিজেকে এমন জায়গায় দাঁড় করাবে যাতে একই সরলরেখায় একাধিক হরিণ পাওয়া যায়। তাহলে সেই সরলরেখা বরাবর মাটির সমান্তরালে সামনের হরিণটাকে লক্ষ্য করে গুলি চালালে সামনেরটা গায়ে যদি নাও লাগে তাহলে পিছনের অন্য কোনোটার গায়ে লাগবে। মোট কথা যে কোনো একটা হরিণের গায়ে গুলি লাগবার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। কোনো ঝুঁকি নিচে চায় কি কৌশিক।

মেঘলা আকাশ, একবারমাত্র রোদের আভাষ দিয়ে আকাশ কালো হয়ে এসেছে। বর্ষায় ধুয়ে যাওয়া পাহাড়ের সৌন্দর্য, তাকে উপভোগ করার ক্ষমতা কৌশিকের নেই। বেলা গড়ায় কোনো ঘটনা ছাড়াই। হরিণের দলও আসে না। একবার দুটি মাত্র হরিণ প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে এসে দাঁড়িয়েছিল। গুলি চালানোই উচিত হয়নি। একটা হরিণ কৌশিকের দিকে তাকিয়ে দেখছিল আর অন্যটা দাঁড়িয়েছিল কৌশিকের দিকে পাশ ফিরে। হরিণ দুটোর মধ্যে কোনো ভয়ের চিহ্ন ছিল না। দ্বিতীয়টার দাঁড়াবার ভঙ্গিটা কৌশিকের মনে হল উদ্ধত। যে ঔদ্ধত্যর জন্য কাল রাতে ছটফট করেছে। তখনই গুলি চালাল কৌশিক। গুলিটা হরিণগুলোর গায়ে না লেগে লাগল পিছনের পাইন গাছটায়। তাতে পাইন গাছ থেকে একটা খুব ছোট ডাল খসে পড়ল মাত্র। আর রাইফেলের ধাক্কায় কৌশিক নিজেই উল্টে পড়ল একটা বড় পাথরের উপর। খুব তাড়াহুড়ো না করে, প্রায় আস্তে আস্তেই নীলচে রঙের হরিণ দুটো দেয়ালের মতো খাড়া পাহাড়ে বেয়ে উঠে গেল।

কৌশিক যখন উঠে দাঁড়িয়েছে তখনও অনেকটা উপর থেকে হরিণ দুটো কৌশিকের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপর আস্তে আস্তে চোছের আড়ালে চলে গেল। তাদের চলে যাবার আগে তাদের পায়ের ধাক্কায় একটা মটরদানার থেকে খানিকটা বড় পাথর কৌশিের জামায় এসে পড়ল। এরপর আর কোনো হরিণ দেখা যায় নি। মহাবীর বলল গুলির শব্দের জন্য আর কোনো হরিণ এদিকে আসবে না। মহাবীর এই অঞ্চলাট ভালো চেনে না। তাই অন্য কোতায় হরিণ পাওয়া যাবে তাও বলতে পারল না। বেলা গরিড়য়ে সন্ধ্যে নামল।

সেদিন প্রথম শিকারের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় সকালের অবসাদ গাঢ়তর হয়েছে। আক্ষেপ করেনি কৌশিক, অপেক্ষা করেছে দ্বিতীয়টির জন্য। সে শিকার আরো জংলী আরো উত্তেজনাময়। মহাবীরই তার ব্যবস্থা করবে— এমন আশ্বাসই দিয়েছে। মহাবীর জিজ্ঞেস করেছিল 'যদি কিছু টাকা পয়সা লাগে?'

—'টাকা পয়সা?'

—'জী ওলোগ বহুত গরীব আদমী। হররোজ খানাভি ন্যাহি মিলতা।'

—'কেতনা?'

—'জি পাতা ন্যাহি। পুছনা হোগা। লেকিন মেরা খেয়াল মে...।' মহাবীর যে পরিমাণ টাকার কথা বলছে তাতে কৌশিক এইরকম অনেক শিকার অক্লেশে করতে পারে।

প্রস্তুতিটা ভালোই হয়েছে। সন্ধ্যের পর কৌশিক রামশরণকে পাঠাল গাড়িটা দেখে আসতে। গাড়ি দেখে আর একটা তাল থেকে চোলাই মদ কিনে আনবে রামশরণ। এটা রামশরণকে কৌশিকের তরফ থেকে সামান্য উপহার। শয়তানের ভাগ্য কৌশিকের। সারাদিনই বৃষ্টি পড়ছে গুড়িগুড়ি। সন্ধ্যের পর এল ঝমঝম করে। আজ আর হুইস্কির বোতল খোলেনি কৌশিক। মাথা ধরেছে জ্বরও আসতে পারে। ঘরে একাই শুয়েছিল। সন্ধের পর মহাবীরই রামশরণের ভাইঝিকে পৌঁছে দিয়ে গেছে, বাইরের বৃষ্টি আর ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচবার জন্য ঘরের দরজাটাও বন্ধ। মহাবীর নিজেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেছে। প্রথমে কিছু বুঝতে পারেনি মেয়েটি। কৌশিক কিছু বুঝতে দেয়নি। মেয়েটি কৌশিকের মাথার কাছে বসে আস্তে আস্তে মাথা টিপে দিচ্ছিল। মেয়েটি মাথা টিপছে, কৌশিক আস্তে আস্তে তার মাথাটা বলিশের উপর থেকে মেয়েটির কোলে রাখে। সময় যায়, বাইরে বৃষ্টিরও বিরাম নেই। তারপর হঠাৎ কৌশিক শক্ত করে মেয়েটির কোমর জড়িয়ে ধরে, সাপের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে মেয়েটিকে তার কাছে আনতে চায়। কিন্তু আঠারো বছরের পাহাড়ি যুবতী, তাকে ধরে রাখবার মতো শারীরিক ক্ষমতাই বা কোথায় কৌশিক গুপ্তর! মেয়েটির হতচকিত ভাবটা কাটতে একটু সময় লাগে। সেই আদিম বর্বরতা, যেটাকে পাশবিক বলা হয়ে থাকে আসলে বোধহয় একান্তই মানবিক, তাকে অনুভব করতে সময় লাগে। তারপর ঠিক উঠে দাঁড়ায় মেয়েটি। চিৎকার করে না, লোকজন ডাকে না। খুব দূরে না গিয়ে কৌশিকের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে তাকে। সে তাকানোতেও কোনো প্রতিহিংসা ছিল না। ছিল তীব্র বিষ। সে বিষ ঘৃণার। যে বিষ ছিল বেলী চ্যাটার্জীর হাসিতে। সে দৃষ্টিতে ছিল একটা তীব্র ঔদ্ধত্যপূর্ণ উদাসীনতা যা কৌশিক দেখেছিল হরিণগুলোর দাঁড়াবার ভঙ্গিতে। তারপর আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে মেয়েটি বেরিয়ে যায়। যাবার সময় একবার ফিরেও তাকায় নি কৌশিকের দিকে।

মহাবীর টাকাপয়সার জোরেও মেয়েটিকে আর কৌশিকের ঘরে পাঠাতে পারেনি।

রামশরণ অনেক বেশি টাকা নিয়েও পরদিন কৌশিকের সঙ্গে হরিণ মারতে যেতে রাজি হয়নি।

দিল্লি থেকে ফিরে এসে কৌশিক শুনল চ্যাটার্জী এখানকার চাকরি ছেড়ে কোনো এক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অপেক্ষাকৃত কম বেতনে অধ্যাপনা করতে চলে যাচ্ছে।